Retail Price Rs. 5/-

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

৪৭ বর্ষ ❀ মে ❀ শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী সংখ্যা ❀ ২০১০ ❀ ১০ম সংখ্যা

পারমার্থিক

মাসিক পত্রিকা

ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা -3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@cal3.vsnl.net.in
visit us : www.gaudiyamission.com
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোন ঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর,
মেদিনীপুর (পূর্ব) ফোন ঃ- 235054 STD-03220
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম,কুলুশীর্ষা,কুড়মিঠা,বীরভূম(পঃ বঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), ফোন-06752-2310671
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী,
১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা ফোন-224057 STD-06782
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001
বিহার ফোন-2225116 STD-0631
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-
211006 (ইউ. পি.) ফোন ঃ-2500925 STD-0532
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন,
মথুরা- 281121 ফোন-2444153 STD-0565
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016 ফোন-26868743 STD-011
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118 ফোন-291709 STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163 ফোন-244-484 STD-03844
৩২। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৩। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর ফোন-276917 STD-03224
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড
জেলা-মথুরা, ইউ পি,
পিন-281504, মোঃ 9760525082
৩৫। শ্রী গৌড়ীয় মঠ, রিহাবাড়ী (মিলনপুর), গুয়াহাটী-৮,
ফোন ঃ 0361-2732049
৩৬। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১৮৩
২।	শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত	শ্রীল প্রভুপাদ	১৮৪
৩।	হরিকথা-প্রসঙ্গ	শ্রীল আচার্য্যদেব	১৮৬
৪।	ভগবান মোহনীয় তাঁর ভক্তগণও মোহনীয়	শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ	১৮৭
৫।	কল্পতরু	শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	১৯০
৬।	পারমার্থিক-প্রদর্শনী	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	১৯১
৭।	দঃ ২৪-পরগণার ভাগবত ধর্ম্মসভার বিবরণী	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ	১৯৩
৬।	শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি	শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহিত	১৯৪
৮।	শ্রীশ্রীনৃসিংহাবির্ভাব	শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহিত	১৯৫
৯।	শ্রীচন্দনযাত্রা	শ্রীক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত	১৭৭

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
— শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
— শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৪৭ বর্ষ ☘ মে ☘ শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী সংখ্যা ☘ ২০১০ ☘ ১০ম সংখ্যা

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা

জীবতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

ভগবানের অংশ কয় প্রকার?

"ভগবানের অংশ দুই প্রকার অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। চতুর্ব্যূহ অবতারগণ—সকলেই স্বাংশ-বিস্তার। জীবই—বিভিন্নাংশ। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে ভেদ এই যে, স্বাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্বের সহিত অভিন্ন অভিমানে সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং কৃষ্ণেচ্ছাতেই তাঁহাদের ইচ্ছা, কোন স্বতন্ত্রতা নাই। বিভিন্নাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে নিত্য ভিন্ন-অভিমানী, স্বীয় ক্ষুদ্র স্বরূপানুসারে অতিশয় ক্ষুদ্রশক্তি-বিশিষ্ট এবং কৃষ্ণেচ্ছা হইতে তাহাদের ইচ্ছা পৃথক্।"

(শ্রীমঃ শিঃ ৬ষ্ঠ পঃ)

জীব কি সর্ব্বময় কর্ত্তা?

"জীব—হেতু-কর্ত্তা এবং ঈশ্বর—প্রয়োজক-কর্ত্তা। জীব নিজ-কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী হন এবং যে ভাবি-কর্ম্মের উপযোগী হন, সেই সকল ফলভোগ ও কার্য্যকারণে প্রয়োজক-কর্ত্তা হইয়া ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর—ফল-দাতা, জীব—ফল-ভোক্তা।" —*জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ*

জীব কি নিত্য না অনিত্য বস্তু?

"জীবকে নিত্যও বলা যায় এবং অনিত্যও কহা যায়। জীবের কারণই পরমেশ্বরের শক্তি এবং ঐ শক্তি নিত্য, অনাদি ও অনন্ত; অতএব কারণ-গুণের অবলম্বনে জীবের নিত্যতা স্বীকার করা যায়। ** এই অনাদি অনন্ত শক্তির পরিণাম যে জীব, তিনি কারণ-গুণে নিত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। অতএব যদি কখনও জীবকে লয় করিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে লয় অবশ্যই হইতে পারিবে; এজন্য জীবকে অনিত্যও কহা যায়।"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

জগতে যতপ্রকার পূজ্য বস্তুর পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম, আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্যের পূজকও অধিক বড় পূজক। সেই পূজককে ভগবান্ও পূজা করে থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত। সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁ'র পূজা করে থাকেন, তাঁ'র পূজা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বেশী। গুরু অর্থাৎ সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমস্ত জগতের গুরুতত্ত্ব। গুরুবিদ্বেষী জগদীশের বিদ্বেষী। নিষ্কপটে এ বিচার না আসলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভৃত্য হওয়া যায় না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা যায় না—নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—'তৃণাদপি সুনীচ, অমানি-মানদ হ'য়ে হরিকীর্ত্তন ক'র্তে পারা যায় না। সমগ্র জগদ্বাসী আমার মান্য বা নমস্য—এই বিচার না আস্লে, গুরুপাদপদ্মে নমস্কার ক'রতে পারি না। গুরুপাদপদ্মে ঐরূপ অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা থা'ক্লেই সমগ্র জগৎকে মান দেওয়া যে'তে পারে—নিজে অমানী হওয়া যেতে পারে—সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করা যেতে পারে।

সাধুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য জীবের যেসকল সঞ্চিত দুষ্টবুদ্ধি আছে তা' ছেদন ক'রে দেওয়া; ইহাই সাধুদিগের অকৃত্রিম অহৈতুকী বাঞ্ছা। দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ ক'রে জগতের লোক বাহিরের দিকে একরকম কথা, ভিতরের দিকে অন্যরকম কথা পোষণ করে; আর দ্বিহৃদয়তাকেই উদারতা বা সমন্বয়ের ধর্ম্ম ফলে প্রচার ক'রতে চায়। যাঁ'রা দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ না ক'রে, সরল হ'তে চান—সরলভাবে আত্মার বৃত্তি যাজন ক'রতে চান, তাঁ'দিগকে ঐসকল দ্বিজিহ্ব ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক, গোঁড়া প্রভৃতি ব'লে থাকেন। যাঁ'রা দুঃসঙ্গ, দুঃসঙ্গকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন ক'রতে হবে।

আধ্যক্ষিক জ্ঞানদাতা গুরু, আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ক'রবার গুরু বা ইহজগতে যাঁ'দের নিকট হ'তে এই শরীর লাভ ক'রেছি, সেই জনক-জননী গুরু—এঁরা সকলেই আংশিক গুরু। যিনি জন্মে জন্মে—নিত্যকাল আমার গুরু, যে গুরুর প্রতিবিম্ব জগতের প্রত্যেক লঘু বস্তু, প্রত্যেক বস্তু যাঁ'র সেব্যের সেবোপকরণ, সেই গুরুপাদপদ্মই গুরুত্বের পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব ধারণ করেন। সমগ্র জগৎ সেই গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক রেণু-পরমাণুতে—গুরুর সম্বন্ধ পরিস্ফুট। তাঁ'দের অসম্মান বা অনাদর করা গুরুসেবকের কর্ত্তব্য নহে।

আমাদের কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা করা উচিত। তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন; যে-কোনভাবে,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরভাবে তাঁ'র সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা হ'লে তিনি তদনুরূপ কৃপা ক'রে থাকেন। সেব্যের সঙ্গে সেবক সংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহ সহ তাঁ'কে লাভ করেন। যাঁ'রা সে বিষয়ে উদাসীন, তাঁ'রা একাদশী ব্রতাদির নামে পিত্তবৃদ্ধি করেন। তাঁ'দের হরিবাসর হয় না। হরিকে লাভ ক'রতে হ'লে হরিকথা আলোচনা করা দরকার। বদ্ধজীব জড়জগতে এসে সঙ্কোচধর্ম্মে অবস্থিত। তা'দের যা বিচারপ্রণালী, তা'তে তাঁ'রা কাম-ক্রোধাদি নক্রমকরের দ্বারা কবলীকৃত হ'য়ে প'ড়ে আছে। তা' হ'তে উদ্ধার চাইলে ভগবান্কে আশ্রয় ক'রতে হ'বে। সেই ভগবানের সঙ্গে আমাদের কি পরিচয়, সেই সম্বন্ধজ্ঞানটি আগে হওয়া দরকার।

আমরা সব সময় কৃষ্ণ ভুলে আছি, যিনি কৃপা ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রতে আসেন, তাঁ'কে আড়াল ক'রে কপটতা, প্রতারণা, কর্ম্মাগ্রহিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। সেবাপরায়ণ হওয়া চাই। সেবা-চেষ্টাকে ধ্বংস ক'রে গুণজাত জগতের বিচারবৈক্লব্যের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য নয়। বাস্তব বস্তুর দর্শনাভাবেই ভোগের দুষ্প্রবৃত্তি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসিদ্ধ কৃপায় ভগবান্ কি বস্তু, তাহা শ্রৌতপথে জান্তে পারি, অপ্রাকৃত বস্তুর অনুসন্ধানস্পৃহার উদয় হয়। মানবের শ্রবণ করিবার জন্যই শব্দের আবির্ভাব হয়। আবার কর্ণের আবশ্যকতা শব্দশ্রবণের জন্য। শব্দ না থাকলে আমরা বর্ণমালার ব্যবহার ক'রতে পারি না। অমনোযোগীকে মনোযোগী, বহির্ম্মুখকে উন্মুখ ক'রবার জন্যই গুরুবর্গ অপ্রাকৃত শব্দের ব্যবহার ও অনুশীলন করেন। পাঠশালার

বালক যখন উপদেশ শ্রবণে অমনোযোগী হয়, তখন পণ্ডিত মশায় তা'কে কান টেনে মনোযোগী করেন। অপ্রাকৃত শব্দবিৎ শ্রীগুরুদেবও বহির্ম্মুখ ও কৃষ্ণভজনে অমনোযোগী শিষ্যকে কর্ণে আঘাত প্রদান ক'রে আকর্ষণ করেন। অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিপ্লবাত্মিকা বাণী শ্রবণ করতে প্রথম প্রথম শিষ্যের বড়ই কষ্টবোধ হয়। বাণী শ্রবণ করতে করতে বাণীদেবীর কৃপায় আর কষ্ট থাকে না। বাণী শ্রবণে হৃদয়ের অনর্থ দূরীভূত হয়। অনর্থনিবৃত্তি হলে অর্থের প্রয়োজন বোধ হয়। তদবস্থায় হৃদয়টি ভগবৎ বা সেবোপযোগী হয়।

ভক্তি হবে যাতে, তারই রাস্তা করা দরকার। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ-ব্যতীত ভক্তিলাভের আর উপায়ান্তর নাই। সাধু বলতে এরূপ নয় যে, যিনি একটু প্রাণায়াম, গঙ্গাস্নান, ব্রহ্মচর্য্য-পালনাভিনয় বা পাথর পূজা করে বেড়ান। প্রকৃত সাধু কিন্তু অসাধুবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন না। চেহারায় সাধু থাকলে সাধু হওয়া যায় না। সত্যসত্যই সাধু হওয়া আবশ্যক। ভগবানের বিক্রম, তাঁর শক্তির পরিচয় জানা দরকার। সাধুই তা বলে দিতে পারেন। সাধুসঙ্গেই ভগবানের শক্তি জানা যায়। অসাধুর সঙ্গে তা জানা যায় না। অসাধু নিজের বড়াই করে। সাধু কখন নিজের বড়াই করেন না। তিনি আত্মগোপন করে থাকেন। তাঁকে জানতে হলে, **প্রথমে নিজের সাধুসঙ্গ প্রয়োজন কি না, নিজেকে জিজ্ঞাসা করা দরকার। সাধুসঙ্গের জন্য মন ব্যাকুল হলে সাধু নিজেকে তার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। নিজে জেনে নেব বা নিজে চিনে নেব—এরূপ চেষ্টার দ্বারা সাধু চেনা যায় না। সাধুর কৃপাই সাধুকে জানবার একমাত্র উপায়।** যেমন সূর্য্যদেবের কৃপায় সূর্য্য উদিত হয়েছে কিনা জানা যায়, তদ্রূপ সাধুর কৃপারূপ সূর্য্য উদিত না হ'লে সাধুকে চেনা যায় না। সূর্য্যালোক প্রকাশিত হলে যেমন সূর্য্য ও সেই আলোকে অন্যান্য জাগতিক বস্তুসমূহ দেখতে পাওয়া যায় তদ্রূপ সাধুর কৃপালোক প্রকাশিত হলে সাধুকে এবং তৎসম্বন্ধীয় অনেক জিনিষ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়।

লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষ সীমা—শ্রীহরিনাম। পণ্ডিত না হলে হরিনাম হয় না। যাঁরা জগতে বড় হতে অভিলাষী, স্বর্ণ প্রয়াসী, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হবার জন্য ব্যস্ত, তারা পণ্ডিত নন। একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমাদের সমস্ত সুবিধা হবে। আমাদের চিত্তদর্পণে অনেক বাহ্যবিষয়রূপ ধুলি এসে পড়েছে, সেই ভোগোন্মুখচিত্তে সত্যবস্তু প্রতিবিম্বিত হতে পাচ্ছে না। **যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের জগতের লোকের প্রতি "ছোট" জ্ঞান থাকবে, যতদিন পর্য্যন্ত জগতের সকল লোক হরিভজন করছেন,—"সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে" এই প্রতীতিটি না হবে, সেকাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হবে না।**

নিরন্তর হরিনাম-গ্রহণই অষ্টপ্রহর। নামাপরাধগ্রহণ অষ্টপ্রহর নহে। নামাপরাধের ফল—ভুক্তি। নামের ফলে কৃষ্ণে প্রীতির উদয় অবশ্যম্ভাবী। কেহ হরিনাম করছেন কি না, তার ফল দেখেই বুঝা যায়। হরিনাম করতে করতে যদি আবার কারও সংসারের প্রবৃত্তি বা সংসারবুদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তা হলে তার কীর্ত্তিত বিষয় "হরিনাম" নিশ্চয় নয়, জানতে হবে। কৃষ্ণনামে কৃষ্ণের তোষণ হয়।

—০—

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধুলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে-মিশে থাক্‌বেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন-নির্ব্বাহ করে চল্‌বেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়্‌বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না, নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়্‌বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন কর্‌বেন। *(গৌড়ীয় ১৫ খণ্ড ২৩-২৪ সংখ্যা)*

হরিকথা প্রসঙ্গ

বিপৎপাত বা দুঃখকষ্টাদি সবই ভগবানের এক একটি দয়ার পরিচয়। তিনি করুণাময়, তিনি সর্ব্বত্র আছেন,—একথাটি মনে থাকিলে মহা সঙ্কটেও আমাদিগকে উদ্ব্যস্ত হইতে হয় না। বিপদেই হউক বা সম্পদেই হউক সর্ব্বাবস্থাতেই ভগবানের নামগ্রহণ বা ভগবান্‌কে ডাকাই একমাত্র কৃত্য। যিনি 'কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা'—ইহা ঠিক করিয়াছেন,'' তাঁহার কোন অসুবিধা হয় না। **কৃষ্ণবিস্মৃতিই বিপদ্। জাগতিক আপদ্-বিপদ্ আমাদিগকে ভগবানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; সুতরাং যে বিপদ্ কৃষ্ণস্মৃতিরূপ পরমসম্পদের জনক, সেইরূপ মঙ্গলপ্রসূ বিপদ্ই আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয়।** জাগতিক সম্পদ্ অপেক্ষা সেরূপ বিপদ্ খুবই ভাল। শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলময়। প্রত্যেক শুভাশুভ ঘটনা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাতে তাঁহার করুণারাশি বিশেষভাবে অনুস্যূত আছে। কোন একটি ঘটনা আপাততঃ বিশেষ অসুবিধাকর বলিয়া মনে হইলেও তাহা পরে কোন বিশেষ সৌভাগ্যের কারণ হয়, একথা অনেকেই অল্পবিস্তর অবগত আছেন। ভগবানে শরণাপন্ন হইতে পারিলে আর চিন্তা নাই। সুতরাং কৃষ্ণসেবা-বিমুখতার জন্য স্বীয় প্রাক্তন ও প্রারব্ধ কর্ম্মরূপ আসন্ন বিপদে বা সম্পদে ভগবান্ই আমাদের শরণ্য হউন।

জীব অনন্ত। এই অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মনুষ্য-দেহ পায়। আবার হাজার হাজার মনুষ্যের মধ্যে কেহ নিত্যমঙ্গল লাভের জন্য যত্ন করে। আবার হাজার হাজার তাদৃশ সিদ্ধের ভিতর কেহ ঠিক্ ঠিক্ ভগবান্‌কে জানিতে পারেন অর্থাৎ তাঁহার সেবালাভ করিতে পারেন। হরিভজন এত দুর্ল্লভ জিনিষ! ইহা দুর্ল্লভ বলিয়া হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলে হইবে না। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে ভগবৎকৃপায় আমাদের সুযোগ লাভ হইবে। যদি ইহাতে উদাসীন থাকি, তাহা হইলে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, বজ্রপাত, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবতাপ, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তাপ হইতে আমরা রক্ষা পাইব না। হরিবিমুখতাই এই ত্রিতাপের মূল। সুতরাং যদি পরা শান্তি চাই, তাহা হইলে হরিসেবোন্মুখ হইবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ এবং তাহা বিশেষ যত্নের সহিত করিতে হইবে। নতুবা মঙ্গলের আশা নাই।

''সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥''

জীবন্ত সাধুর সঙ্গের প্রভাব খুব বেশী। অকপট সঙ্গলিপ্সু ব্যক্তিমাত্রই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। সৎসঙ্গই জীবকে সৎসঙ্গী করায়। যিনি অকপটে সাধুসঙ্গ করেন, তিনি সাধুসঙ্গফলে জানিতে পারেন যে, তিনি সাধুর সঙ্গী, আশ্রিত বা অনুগত দাস। সাধুসঙ্গ করিতে করিতেই সাধুতে আপনজ্ঞান বা প্রীতি হয়। সাধুসঙ্গদ্বারাই ভগবৎসঙ্গ লাভ হয়। সাধুসঙ্গেই কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণসঙ্গ হয়। কৃষ্ণবিলাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ সাধু যেখানে নাই, সেখানে ভগবান্ও নাই। ভগবান্ সাধুরই। তিনি সাধুরই প্রাণধন। আবার শ্রীভগবানের যথাসর্ব্বস্বই—ভক্ত। যিনি সাধুর প্রিয়, তিনিই ভগবানের প্রিয়। সাধুতে যাঁহার প্রীতি নাই, ভগবানেও তাঁহার প্রীতি থাকিতে পারে না। যিনি সাধুর, তিনিই ভগবানের। সাধুর আশ্রিতই ভগবদাশ্রিত। ভগবানের সেবা বা ভক্তি লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গই মূল। সাধু এ জগতে গুরু বা বৈষ্ণবরূপে প্রকটিত হন। কৃষ্ণনিষ্ঠ সাধুগণ স্বতঃই বৈরাগ্যবান্। কৃষ্ণেতর বিষয়-বৈরাগ্য কৃষ্ণভক্তকে আশ্রয়-স্বরূপে পাইয়া ধন্য হয়। সাধুর অনুগত না হইলে সাধুকে কেহ চিনিতে বা জানিতে পারে না, সাধুর সহিত আলাপাদি করিয়াই তাঁহার সন্ধান পায় না। ইহা কৃষ্ণভক্তের ঐশী-শক্তি। সাধু বাঞ্ছাকল্পতরু। সেবাভিলাষীই তাঁহার নিকট সেবা বা কৃপা পায়, আর অন্যাভিলাষী বা বঞ্চনাকামী বঞ্চনাই লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তের সকল ভঙ্গী অকিঞ্চন ক্ষুদ্র জীব সকল সময় তাহা বুঝিতে না পারিলেও তাঁহারা দয়া-পরবশ হইয়া দেখাইয়া দেন। কৃষ্ণানুশীলন ও দুঃসঙ্গত্যাগ একাধারে উদয় না হইলে শুদ্ধভক্তি প্রকট হন

না। কুসঙ্গ-বর্জ্জনই নিঃসঙ্গ এবং সজ্জনসঙ্গই কুসঙ্গ-বর্জ্জনের উপায় ও উপেয়। সংসার-ভোগবাসনা-ব্যাধিগ্রস্ত আমাদের সাধুসঙ্গ বা সাধুর কথা ভাল লাগে না। অবশ্য রোগী প্রাকৃত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া হিতাহিত বিবেক-রহিত হইয়া ঔষধের নিন্দা করিতে পারেন, সুপথ্যের অমর্য্যাদা করেন, কিন্তু উহাই তাঁহার একমাত্র সেব্য জানিলে প্রাকৃত যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া সেই রোগী শুদ্ধ হরিসেবা লাভ করিতে পারেন। জীব স্বতন্ত্র; সুতরাং তাহাদের স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমাদের নাই। আমরা জোর করিয়া কাহাকেও কোন কথা বলিতে চাহি না। শ্রদ্ধালু জনগণ এইসব কথা শ্রবণ করিয়া সেবায় উত্তরোত্তর উৎসাহান্বিত হউন, ইহাই নিবেদন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া গতি দেখি না। তাই আমরা সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তন্নিজজনগণের প্রসাদ ভিক্ষা করি। শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেই কোন জীব মিছাভক্ত, আবার কেহ বা নিষ্কপট। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাই সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব একবস্তু হইয়া ছয়টি বিভিন্ন তত্ত্বে প্রকাশিত—গুরুতত্ত্ব, শ্রীবাসাদি ভক্ততত্ত্ব, অংশাবতার অদ্বৈততত্ত্ব, স্বরূপ-প্রকাশ নিত্যানন্দতত্ত্ব, শ্রীগদাধরাদি নিজশক্তিতত্ত্ব ও স্বয়ং ভগবত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই ছয়তত্ত্বই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সুতরাং গুরুতত্ত্বও যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

সকল বৈষ্ণব, শুন করি' একমন।
চৈতন্য-কৃষ্ণের শাস্ত্রে যেমত নিরূপণ ॥
কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়ই গুরুতত্ত্ব। দীক্ষা গুরু ও শিক্ষাগুরুর লীলাভেদ থাকিলেও শিষ্যের নিকট উভয়ই সমতত্ত্ব ও সমভাবে পূজ্য। অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে ছয়তত্ত্বই ভগবান্, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অংশাবতার শ্রীঅদ্বৈত, প্রকাশস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীগুরুদেব—এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও এই পাঁচটি তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ ভগবান্ই। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন; তিনি কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয়বস্তু। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়। 'কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁ'র মাধুর্য্য-আস্বাদন।' 'কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ।'—এইসব কথা বিশেষরূপে আলোচ্য।

—০—

ভগবান মোহনীয় তাঁর ভক্তগণও মোহনীয়

শ্রীল আচার্য্যপাদের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ

গোদ্রুম, ১০ই জুন, ২০০৬

পরম আরাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় আজ আমরা পরম আরাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যপাদের শততম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে গোদ্রুমধামে আয়োজিত মহতী ধর্ম্মসভায় একত্রিত হয়ে ভক্তগণের মুখ থেকে কতিপয় দিবস তাঁর প্রকীর্ত্তিত যে সমস্ত গুণাবলী এবং শাস্ত্রবাণীর কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করবার সুযোগ পেয়েছি তাতে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।

অনেকে শোনেন নাই বা অনেকে শুনলেও ভুলে গেছেন যে মহাজনের কৃপাতে মহাজনকে পাওয়া যায়। মহাজনের কৃপা ছাড়া তাঁদের হৃদয়বত্তাকে অনুভব করা যায় না। সূর্য্যের কিরণেই যেরকম সূর্য্যকে দেখা যায়, সেরকম মহাজন বা ভগবানকে দর্শন করতে গেলে তাঁদের কৃপাতেই দর্শন হয়, এছাড়া দর্শন করতে যাওয়া বাতুলতা। তাঁরা কৃপাময় অবতার। শ্রীল আচার্য্যপাদ কৃপা বিস্তার করার জন্যই

আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি স্বল্প সময়ের জন্য আমাদের ভাগ্যাকাশে উদিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আজীবন কৃষ্ণানুশীলনে ব্রতী ছিলেন—কি বাল্য, কৈশোর, যৌবনে, কি শিক্ষক অবস্থায় পরে যখন তিনি মহান্ আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন পেলেন তখন তাঁর আলোয় আলোকিত হয়ে ভাগবত আচার্য্য কেশরী রূপে গৌড়ীয় গগনে আবির্ভূত হলেন। তখন কয়েকটি সভায় তাঁর সঙ্গে থাকবার আমি সুযোগ পেয়েছিলাম। উড়িষ্যায় একটা Stadium-এ ভক্তবৃন্দ আহ্বান করে আচার্য্যপাদকে নিয়ে গেছিলেন—আমরাও গেছিলাম সেই সভাতে। অসংখ্য অসংখ্য লোক, তার মধ্যে গর্জে গর্জে প্রভুপাদের বাণীকে, শ্রীমদ্ভাগবত থেকে মহাভাগবতের মুখ নিঃসৃত বাণীকে কীর্ত্তন করেছিলেন সেই প্রকীর্ত্তিত শ্রুতির আবৃত্তি তাঁর মুখে শুনেছিলাম। আরো কত কথা শুনেছি কিন্তু এটা খুব impact করেছিল; এখনও মনে আছে। আরো তিনি যখন London-এ গেলেন সেখানকার নতুন নতুন ভক্তদেরকে ভক্তিরসে আপ্লুত করেছিলেন—সেগুলো শোনার আমার ভাগ্য হয়েছিল। গৌড়ীয় মঠে যে রোজ পাঠকীর্ত্তন হত তাতে আমার বিশেষ থাকার সুযোগ হত না—কেন না আমাকে সেবার জন্য অন্যত্র যেতে হত। শুনলে শোনা হয় না, দেখলে দেখা হয় না, বললে বলা হয় না—যদি না তিনি কৃপা করে আবির্ভূত হন। ভগবান গৌরসুন্দর যেরকম কৃপাময় গৌরের ভক্তগণও সেরকম কৃপাময়। তাঁদের কৃপাতে আর কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না। ভগবান্ মোহনীয়, আর ভক্তগণও তাঁর মোহনীয়। ভগবানের যাঁরা মোহনীয় তাঁরা অনন্ত গুণে বিভুষিত না হলে ভগবানকে মোহিত করতে পারেন না। রাধারাণী যে রকম মোহনীয় গুণের দ্বারা কৃষ্ণকে সবসময় সুখময় করে রাখেন, তাঁর চিত্তকে রসায়িত করে রাখেন—সেরকম ভক্তগণও রসায়িত করে রাখেন ভগবানের চিত্তকে। যেমন আকর্ষিত হন তেমনি আকর্ষণ করেন, এই হচ্ছে ভক্ত-ভগবানের বৈশিষ্ট্য। শ্রীল আচার্য্যপাদ যেখানে বিরাজ করতেন, বিশেষ করে কলকাতা মঠে তাঁর অবস্থান কালে সেখানকার পরিবেশ কেমন থাকত দেখেছি। গুরুমহারাজ একবার বলেছিলেন যে, তিনি (আচার্য্যপাদ) অতিশয় careful ছিলেন সব বিষয়ে, মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে Practical side-এ তিনি ভোর বেলায় কাউকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলে অতিশয় দুঃখিত হতেন। আরতি কীর্ত্তনের সময় তিনি ঘণ্টার পর ঘন্টা ধরে কীর্ত্তন করাতেন। মঙ্গল আরতি কীর্ত্তনের সময় ভগবানের নামাবলী অসংখ্যবার আবৃত্তি করে নিজে নন্দিত হতেন এবং ভগবানকে নন্দিত করতেন। এসব যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই প্রমাণ হয়ে আছেন।

"যে দেখিল সেই তার সাথি।"

যে না দেখেছে অনুমান করে কি বুঝবে। নাট্যমন্দির জুড়ে নৃত্য-কীর্ত্তন করাতেন। আমাদের কলকাতার নাট্যমন্দির তো ছোট নয়—একেবারে **গুরুবর্গের পাদপদ্ম থেকে হরিদেবের পাদপদ্ম পর্যন্ত।**

"শ্রীহরি বাসরে হরিকীর্ত্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিল প্রভু জগতের প্রাণ ॥"

তিনি তাঁর গুরুপাদপদ্মের কৃপাতে আবির্ভূত সত্যকে পুনরায় আবির্ভূত করিয়েছিলেন। সেই সত্যকে আবির্ভূত করাতে পারেন যাঁরা সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তিনি শাস্ত্র অনুশীলন করিয়ে সকলকে শাস্ত্রের কথাটার যথার্থতা উপলব্ধি করানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। অন্য কথা লোক ভুলে যেতে পারে, বা বদলে যেতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের কথা বদলাবে না—নিত্যকালের জন্য থেকে যাবে। সেই angle থেকে যদি একবার কেউ অনুশীলন করে বলতেন তিনি খুব উল্লসিত হতেন—ভাবাবিষ্ট হয়ে যেতেন—এটা আর একটা দিগদর্শনের কথা। আমার অতি ক্ষুদ্র ভাগ্য হলেও এগুলো আমার চিত্তে লেগে আছে। আমি যখন প্রথম আসি তখন নির্বোধ ছিলাম, এখনও তাই আছি কিন্তু দয়াটা বুঝতে পারি। যখন প্রথম আসি তখন—ব্রহ্ম-পরমাত্মা তত্ত্ব বোঝাতেন। আমার ঘুম লাগতো। প্রথমে কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম না। তারপর যখন একটু সাহস হল জিজ্ঞেস করলে বলতেন, তুমি সব বুঝতে পারবে। আর তিনি সব থেকে বেশী উল্লসিত হতেন শ্রৌত কথার অনুকীর্ত্তন যদি কেউ করতে পারত।

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥"

(ভাঃ ১০।৩১।৯)

পরে যখন এসব কথাগুলো শুনলাম তো স্নিগ্ধ কণ্ঠে হীরের

টুকরোর মতো লাগতো। পরে বুঝলাম, এসব কথা কীর্ত্তন করবার মতো লোক আমাদের কাছে থাকলেও আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তবু তিনি কৃপা করে যে সমস্ত ভাগ্যবান্ জীবকে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন তার আলোকে সেই ভাগ্যবানদের সান্নিধ্যে থাকলে আমরা বেঁচে থাকব। কেউ জানতেন না কৃষ্ণের অন্তর্ধান হবে। কৃষ্ণ কৃপা করে বলেছিলেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥"

(গীঃ ৯।৩৪)

—অর্জ্জুনকে বলেছিলেন। অর্জ্জুন কৃষ্ণগত প্রাণ, কৃষ্ণ ছাড়া তাঁর বাঁচার উপায় ছিলনা। তাই তিনি তাঁকে বলেছিলেন— তুমি আমাকে পাবে এইভাবে—

"মন্মনা ভব ... ... মৎপরায়ণঃ ॥"

তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় তাই তোমাকে এসব কথা বললাম। এখন আমাদের বেঁচে থাকতে গেলে এই কথা গুলোকেই আমাদের অনুসরণ করে চলতে হবে।

Actually আমরা কাকে পাই? যার গুণপনার কথা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চর্চা করি তাকেই তো আমরা পাই। সেরকম ভগবানকে যদি আমাদের পেতে হয়—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥"

—এই মন্ত্রে পুর্ণঃদীক্ষিত হতে হবে। আমরা সৌভাগ্যবান বা হতভাগ্য এসব কথার বিচার নাই। যদি সম্বন্ধজ্ঞান গুরুবর্গের কৃপাই আমাদের লাভ হয়ে থাকে তাহলে সেই সম্বন্ধজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করতে হবে। কৃষ্ণ আর কার্ষ্ণ এই নিয়ে জগৎকে দেখতে শিখলে মায়ার বন্ধন থেকে উপরে আসতে পারব, না হলে যে তিমির সেই তিমিরেই পড়ে থাকতে হবে। যদি এই দর্শনটা খুঁজে না পাই, গুরুবর্গের কৃপাকে অনুভব করতে না শিখি, তাহলে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের সাগর থেকে কেউ ওঠাতে পারবে না। **সেজন্য ভগবানের দয়ার স্বরূপ হচ্ছে গুরুদেবের অবতার-দয়ামূর্ত্তি নিয়েই গুরুদেবের আবির্ভাব।** আমরা শতবর্ষ সমারোহ করছি কেন? এই শতবর্ষের আলোকে রঞ্জিত হয়ে থাকলে আরো শতবর্ষ আসবে। শুধু তাই নয় গুরুবর্গের আবির্ভাব, তিরোভাব আদি তিথি পালনের দ্বারা আবার সেটাকে revitalised করতে হয়। আমরা জগতে শত শত জন্ম তো বেঁচে থাকব না, কিছুদিন পরে সবাই এখান থেকে চলে যাবো। —এটা ভগবানের খেলাঘর। এছাড়া কিন্তু এর নিত্যত্ব নাই। এখানে ভক্ত-ভগবানের নিত্যলীলা রাস চলছে। এইভাবে যদি আমরা দেখতে না শিখি তাহলে অত্যন্ত অন্যায় করব, ভুল করব। সেজন্য গুরুবর্গের দয়াতে, শাস্ত্র দৃষ্টিতে যে সমস্ত জিনিষ লাভ হয়েছে সেটাই হচ্ছে আমাদের ভাগ্যের মনিকোঠায় সুরক্ষিত গুপ্তধন। এটা অত্যাশ্চর্য্যভাবে সুন্দর যে প্রত্যেকটা জিনিষকে তিনি এমনি শুধু statement দিয়ে যেতেন না পরে কেউ যদি চতুর হতেন, শাস্ত্র দৃষ্টিতে মেলাতে শিখতেন, তাতে তিনি খুব আনন্দ পেতেন। কখনো যদি আনন্দের সঙ্গে বলতাম গুরুদেব, আপনি এসব কথা বললেন—প্রভুপাদের কথায় আছে। গুরুমহারাজের কথায় আছে, শাস্ত্রে এই এই জায়গায় আছে। তিনি বলতেন, তাই নাকি? আমি কিন্তু এসব না পড়েই বলছি। অর্থাৎ তিনি তাঁর পঠন-পাঠন actually অনুভব করে সেই কথাটাকে systematic রেখে গেছেন। সুপটু আচার্য্য যিনি, তিনি এইভাবে কলিহত জীবকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর সমস্ত সত্ত্বাকে লাগিয়ে দিয়ে থাকেন। অতল সমুদ্রে যেমন মণি থাকে, ডুবুরিরাই তার সন্ধান দিতে পারে, সেরকম ডুবুরির মতো শাস্ত্রের সারটাকে তুলে নিয়ে ভগবানের উপলব্ধিটা তাঁদের বর্ণনার দ্বারা রেখে যান, তাঁদের সত্ত্বার দ্বারা রেখে যান। সেজন্য আমরা শাস্ত্র না বুঝলেও তাঁদের কথা যেন অনুশীলন করতে শিখি, তাহলে আমাদের মঙ্গল অনিবার্য্য। তিনি একেবারে মতিহীন বালককে পাঠশালায় শিক্ষকরা যেরকম হাতেখড়ি দিয়ে একেবারে অযোগ্য অবস্থা থেকে তাকে যোগ্যতা দিয়ে উন্নত পর্য্যায়ে নিয়ে আসেন, সেরকম ভাবেই আমাদের তৈরী করেছেন বলে আমরা নিত্যকাল তাঁর পাদপদ্মে বিক্রীত হয়ে গেছি।

শাস্ত্রে একটা কথা আছে তোমাকে অর্থাৎ ভগবান্‌কে জানবে যারা শ্রুতিক্ষিত পথে জানতে শিখেছে। জগতের লোকে দেখে এক, আর ভক্তরা দেখে আর এক। কেন? ভক্তদের শ্রুতি চোখ আছে—শ্রুতিক্ষিত পথে তাঁরা দেখতে শিখেছেন। মাটিয়া জগতের লোক তারা হচ্ছে মাংসদৃক্। যা

হচ্ছে সেটাই দেখে। কিন্তু শ্রুতিশাস্ত্রবিদ্ তাঁরা শাস্ত্র দৃষ্টিতে দেখেন। বিজ্ঞজনের অনুভব কি এবং শাস্ত্রের অনুভব কি এইভাবে তাঁরা দেখতে শেখেন। এই যে দেখবার কুশলতা এটা যে যত তীব্রভাবে লক্ষ্য করতে শেখান তিনি তত বড় আদর্শ শিক্ষক বা গুরু। এই গুর্ব্বানুগত্যে যতই আমরা চলতে শিখব ততই আমরা পাগল হয়ে ভগবানের অনুসন্ধান করে জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। এই আশা নিয়ে আজ আমরা তাঁদের চরণে বারবার প্রণতঃ হই যারা আমাদের সঙ্গে সহমর্মী হয়ে সহযোগিতা করেছেন এই শতবার্ষিকী উৎসবে এবং অনুরোধ করবো এইভাবে উৎসাহের সঙ্গে যেন সকলেই প্রত্যেক তিথি পালনের দ্বারা বৈকুণ্ঠ রাজ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারি।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্য নমো নমঃ ॥"

—০—

কল্পতরু

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ

(সেবাসচীব, গৌড়ীয় মিশন)

কল্পতরু অভিষ্ট ফলদায়ী এক বৃক্ষ। বৃক্ষ বাঞ্ছাপূর্ণ করতে সমর্থ এ এক আশ্চর্য্যের কথা তথাপি সত্য। সংসারে আমাদের আশা বা চাহিদার অন্ত নেই। সেক্ষত্রে এরূপ কোন বৃক্ষ অর্থাৎ কল্পতরু পাওয়া বিরাট আনন্দের কথা। মানুষ মানুষের অভিষ্ট পূরণ করতে অক্ষম হয় অথচ বৃক্ষ সে বিষয়ে সমর্থ—এ ভাবতে অবাক লাগে।

দেবলোকে এইরূপ বৃক্ষ রয়েছে। তাই কল্পতরুকে সুরতরুও বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে এর অবস্থান শ্বেতদ্বীপস্থ গোলোকে। সেস্থানে বৃক্ষমাত্রই কল্পতরু এবং সংখ্যায় তারা অনন্ত। তাদের ক্ষমতাও অসীম। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ছাড়া ভগবৎ সেবা বা প্রীতি পর্য্যন্ত দানে তারা সমর্থ। গোলোকে এর স্থিতি বিষয়ে ব্রহ্মার স্তবে আমরা প্রমাণ পাই—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই সংসারে এমন একটি বৃক্ষকে আমরা সাক্ষাৎরূপে পাচ্ছি না। ভগবৎ ইচ্ছায় জাগতিক কামনা-বাসনা তৃপ্তির জন্য এজগতে তার স্থান নেই। সর্বফলপ্রদ হলেও মিথ্যা ধন-জন-গৃহ-দ্বার আদি দেওয়ার জন্য ঐরূপ বৃক্ষ এখানে নেই। কেননা ঐসকল বস্তু বাস্তবে সুখ দিতে পারে না। তাই এজগতে কল্পতরুর আর্বিভাব নেই। তথাপি ভগবান নিজেকে দেবার জন্য অন্যপ্রকার কল্পবৃক্ষ এই পৃথিবীতে রেখেছেন যাতে দুঃখী জীব তাকে পেয়ে নিত্য সুখের সন্ধান পেতে পারে। তার মধ্যে বেদরূপ কল্পবৃক্ষ ও ভক্ত বা সাধুরূপ কল্পবৃক্ষ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় শ্লোকে আমরা পাই—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥

এখানে শব্দ কল্পতরু। বেদরূপ কল্পতরুর কথা। ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী কল্পতরুর ন্যায় আমাদের পুরুষার্থ দানে সমর্থ। মুনি-ঋষিগণ কর্ত্তৃক এই বাণী জগতে প্রচারিত হচ্ছে। শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে মানব ঐসকল কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করলেই ত্রিতাপ জুড়িয়ে যায়, এক নিত্য আনন্দময় বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় এবং নিত্যসুখ লাভ হয়। আমরা প্রত্যেকে সুখ চাই। দুঃখ কেউ চাই না। সুখ আমাদের পুরুষার্থ, তার জন্যই যত চেষ্টা। বেদ-ভাগবত-পুরাণ রূপ কল্পতরুর সেবাদ্বারা আমরা সেই সুখ পেতে পারি—এ এক মস্ত বড় সুযোগ।

তাছাড়া জগতে আর একটি কল্পবৃক্ষের কথা আছে। সেটি হল কৃষ্ণভক্ত বা সাধু।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্য নমো নমঃ ॥

পতিত জীবকে ত্রাণ করার বিষয়ে বৈষ্ণবই একমাত্র সম্বল।

তিনি কল্পতরুর ন্যায় সকল বাঞ্ছাপূরণে সমর্থ। এবং সবচেয়ে বড় কথা এ জগতে সাক্ষাৎভাবে আমরা তাঁকে পাচ্ছি। এ এক বড় সুবিধা। কিন্তু অজ্ঞান জীব তা বুঝে উঠতে পারে না। জাগতিক ধন-জন-বিদ্যার কামনায় পাগলপারা আমরা। কল্পতরুকে সাক্ষাৎভাবে পেয়েও কাজে লাগাতে পারি না— এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। শব্দরূপী কল্পবৃক্ষ এবং কৃষ্ণ ভক্তরূপ কল্পতরু আমাদের নিকট ভগবৎ কৃপায় এসেছে। আমাদের এই দুইকে কাজে লাগিয়ে নিত্যসুখের সন্ধানে লেগে পড়াই উচিত।

ভ্রান্ত জীব আমরা আজ ব্যস্ত অন্য কল্পতরুর সন্ধানে। কল্পতরু বলতে আমরা বুঝি কোন সাধু, জ্যোতিষী, যার কাছে গিয়ে আমাদের জাগতিক লাভ কিছু উঠাতে পারি। এরূপ বুজরুগি জানা সাধু-সন্ন্যাসীর অভাবও নেই পৃথিবীতে। তারা আমাদের মায়িক কিছু লাভ দেখাতে পারলেও বাস্তব শান্তির পথ দেখাতে অক্ষম। সেইসঙ্গে সবথেকে বড় কথা বাস্তব সুখ বা শান্তি চাওয়ার খদ্দের আজ নেই। এদের বড় অভাব। আমরা বঞ্চিত আছি এবং থাকতেও চাই। আমরা চাই ছেলে-মেয়ে-ধন-দৌলত নিয়ে সুখে থাকতে। নিত্য সুখের লোভ আমাদের কোথায়? সম্ভবতঃ সেটাই একমাত্র কারণ এই পৃথিবীতে কল্পতরুর অনুপস্থিতি। ❑

পারমার্থিক-প্রদর্শনী

গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত

পাঠক! যাঁহারা ভগবদ্‌বিগ্রহ, ভাগবত বা শাস্ত্রকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত (?) করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকার্জ্জন করেন এবং উহাকে অন্যান্য ব্যবসায় অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে সাত্ত্বিক শুক্ল-বৃত্তি বলিতে চান, তাঁহাদের বিচার, গবেষণা ও ঐরূপ সাত্ত্বিক দ্রব্যাহারী গুরুভক্ত শিষ্যের দৃষ্টান্তের ন্যায়। তাঁহারা অন্যান্য সকল ব্যবসায়কে দোষযুক্ত সাব্যস্ত করিয়া সত্ত্ব-তনু বিষ্ণুর অভিন্ন কলেবর ভাগবতকে স্ব-স্ব ভোজনাচ্ছাদন-সংগ্রহের যন্ত্ররূপে পরিণত করিয়াছেন। যে কৃষ্ণ ভাগবতরূপে আমাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা সেই শুদ্ধ সত্ত্ব-বিগ্রহ ভাগবতকে পণ্যদ্রব্যরূপে পরিণত করিতে প্রয়াসী হইয়া আমাদিগের ঐরূপ ভীষণ অপরাধজনক কার্য্যকে সাত্ত্বিক ও শুক্ল ব্যবসা (!) বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করিতেছি—কৃষ্ণকে ভোগ করিতে উদ্যত হইয়াছি! গো-ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক তনু, গুরুদেবের সিদ্ধ বা নির্গুণ তনু ভোজনের দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করা যেরূপ 'সাত্ত্বিক' ও শুক্ল আহার্য্য বিচার, ভাগবত-ব্যবসায়কে সাত্ত্বিক শুক্ল-বৃত্তি বিবেচনা করাও সেইরূপ ন্যায়াবলম্বন মাত্র। মিথ্যা, চৌর্য্য, এমন কি, ধর্ম্মব্যাধাদির দৃষ্টান্তে পশু-হিংসা প্রভৃতি পাপ পর্য্যন্ত ক্ষয় হইতে পারে, কিন্তু ভাগবতবিগ্রহের প্রতি অপরাধকে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনামযী যুক্তি দ্বারা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা দেখাইলে তাহা কখনও অপনোদিত হয় না। ভাগবত বা শাস্ত্র-ব্যবসায়িগণ কেবল ভীষণতম অপরাধ করেন, তাহা নহে, পরন্তু সেই অপরাধকে লোকবঞ্চনামযী কুযুক্তি দ্বারা সংরক্ষণ করিতে চেষ্টা করেন, ইহা সমধিক অপরাধের লক্ষণ। অজ্ঞানকৃত অপরাধ সাধু-বৈষ্ণবের মুখে সত্যকথা-শ্রবণ-ফলে বিদূরিত হয়; কিন্তু জ্ঞানকৃত বা স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ এবং তৎসংরক্ষণ-কল্পে নানাপ্রকার যুক্তির সমাশ্রয় ও অধ্যবসায় কখনই অপরাধীকে অনন্ত নিরয়ের পথ হইতে উদ্ধার করিতে পারে না।

স্মৃতিশাস্ত্র লিখিয়াছেন যে, মহা আপদ্ধর্ম্ম উপস্থিত হইলেও ভগবদ্‌বিগ্রহ দ্বারা নিজ-সেবা করিয়া লইবে না। আপদ্ধর্ম্ম উপস্থিত হইল লৌকিক নীতি লৌকিক বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ করিবার উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু কোন বেদানুগ স্মৃতিশাস্ত্রই আপদ্ধর্ম্মের ছলে ভক্তিদেবীকে যূপকাষ্ঠে বলি দিবার পরামর্শ দিতে পারেন না, দিলে উহা শাস্ত্র নহে— লোকবঞ্চনাকারিণী মায়া অধিকন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, যাবতীয় আপদ-বিপদ উপস্থিত হইলেও যিনি ভক্তির প্রতিকূল কার্য্য করেন না, ভক্তিকে পরিত্যাগ করেন না, সেই

সকল আপদকে নিজ-কর্ম্মফলজনিত ব্যাপার এবং ভগবৎকৃপা জানিয়াই নত শিরে তাহা স্বীকার পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে অধিকতর উৎসাহের সহিত ভগবদ্ভক্তি যাজন করিতে থাকেন, তিনিই প্রকৃত লোক-গুরু, লোক শিক্ষক হইতে পারেন। যাঁহারা গুরু, আচার্য্য বা ভাগবত-পাঠক, কথকের কার্য্য করিবেন, তাঁহারা যদি এইরূপ আদর্শ দেখাইতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কথা জগতের কেহ শুনিবেন না।

ভগবদ্‌বিগ্রহকে বিক্রয় করা, ভগবদ্‌বিগ্রহকে নিজভৃত্যত্বে নিযুক্ত করা কখনই ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ শ্রীবিগ্রহ, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীবেদকে নিত্যপূজ্যবস্তু জ্ঞানে পূজাই করেন, তাঁহাদের দ্বারা নিজের কিছু লৌকিক প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া লইবার বৃত্তি প্রদর্শন করেন না। শোকগ্রস্ত শূদ্র কিম্বা ভগবদ্‌বস্তুর অবমাননাকারী অন্ত্যজম্লেচ্ছাদিই ভগবদ্‌বিগ্রহের ঐরূপ অবমাননা করিয়া থাকে।

ঐরূপ ভাড়াটিয়া শাস্ত্র-পাঠকগণের দালালশ্রেণীর বা সমর্থকশ্রেণীর কতকগুলি লোক কোনদিকে বা কোন শাস্ত্রে এইরূপ অপরাধের সমর্থন না পাইয়া পুনরায় বলিয়া থাকেন, ভাগবত-ব্যবসায়ী নিজে অপরাধী, অসচ্চরিত্র, অনাচারী যাহাই হউন না কেন, তাঁহার যদি অনুস্বার-বিসর্গের উত্তম জ্ঞান থাকে, তিনি যদি ভাল 'গলাবাজ' হন, তাহা হইলে তাঁহার মুখোদ্গীর্ণ শাস্ত্রীয় উক্তিগুলি শুনিতে আপত্তি কি? বক্তা না হয় অপরাধী, ব্যভিচারী হইলেন, শাস্ত্রত' আর ব্যভিচারী, অপরাধী হন নাই, সুতরাং অপরাধী, ব্যভিচারী বক্তার মুখে শাস্ত্রের অটুট কথাগুলি শুনিতে কোন দোষ নাই।

এ স্থানে তাঁহাদের ভোগোন্মুখী যুক্তি যে শাস্ত্র-বিগর্হিত, তাহা বলাই বাহুল্য। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥
(পদ্মপুরাণ)

দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু, উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি হয়; কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট দুগ্ধও যদি সর্পের উচ্ছিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা যেমন দুগ্ধের ক্রিয়া না করিয়া বিষেরই ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ সন্মুখরিত পবিত্র হরিকথামৃতপানে জীবের ভক্তি-বৃত্তির উন্মেষ হয়, কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব-ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ উপদেশাদি বাহ্যকারে হরি-কথার ন্যায় দেখাইলেও উহা 'নামাপরাধ' মাত্র। এইরূপ 'নামাপরাধ' শ্রবণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় উহা দ্বারা জীবের অমঙ্গলই হইয়া থাকে। ব্যভিচারী বা অপরাধীর মুখের উচ্চারিত কথাগুলি হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা হরিকথা নহে—''নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়।''

দ্বিতীয়তঃ মহাপ্রভুর শিক্ষায় দেখা যায়,—

আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায় ॥
*   *   *   *   *
নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে ॥

যিনি ধর্ম্মের আচরণ করেন না, তিনি কখনও ধর্ম্মের বক্তা হইতে পারেন না, তাঁহার কখনও নিরপেক্ষতা থাকিতে পারে না। যিনি অর্থের দাস, নিজের ইন্দ্রিয়ের দাস, তিনি কখনও নিরপেক্ষ সত্য প্রচার করিতে সমর্থ নহেন। যে বক্তা অর্থ আশা করেন, তাঁহাকে শ্রোতৃবর্গের বা অর্থদাতার মন-যোগাইয়া কথা বলিতেই হইবে; তিনি নিরপেক্ষ স্পষ্ট সত্য কখনই বলিতে পারেন না। অনুস্বার-বিসর্গের পাণ্ডিত্য বা গলাবাজি করিবার ক্ষমতা থাকিলে যে ভাগবতীয় সত্য প্রচার করিতে পারেন না, তাহা নবদ্বীপের দেবানন্দ পণ্ডিতের আদর্শ দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—ভক্তির দ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য, অনুস্বার-বিসর্গের পাণ্ডিত্য দ্বারা বা লৌকিক বাগ্মিতা দ্বারা কখনও ভাগবতীয় সত্য উপলব্ধ বা প্রচারিত হইতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবের নিকটই ভাগবত অধ্যয়ন করিতে বলিয়াছেন, মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুও বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবিকে তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে দেখা যায়, জনৈক গীতাপাঠী বিপ্রের বাহ্য-দর্শনে অনুস্বার-বিসর্গের কোন জ্ঞান না থাকিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকেই যথার্থ শাস্ত্র-দর্শী বলিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। ❑

দঃ ২৪-পরগণার ভাগবত ধর্ম্মসভার বিবরণী

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে গত ২১ এবং ২২শে মার্চ, ২০১০ তারিখে দক্ষিণ ২৪-পরগণার বিষ্ণ্যাখালি মৌজাস্থিত মৌতলা গ্রামে বিশাল ভাগবদ্ধর্ম সভার অনুষ্ঠান হয়।

২১শে মার্চ, ২০১০ তারিখে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব সেবকগণসহ কলিকাতাস্থ বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে পূর্বাহ্নে Car যোগে যাত্রা করিয়া বেলা ১১টা নাগাদ মৌতাশা গ্রামের সন্নিকটে শুভবিজয় করিলে দক্ষিণ ২৪-পরগণার নামহট্টের সম্পাদক শ্রীভূতনাথ সর্দার ওরফে শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারী, স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীপ্রবোধ নাইয়া, শ্রীপ্রবোধ মণ্ডল, মনোরঞ্জন মিস্ত্রী এবং ভক্ত শ্রীমধুসূদন দাসজী শ্রীগুরুদেবকে পুষ্প মাল্যাদি অর্পন দ্বারা অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানান। শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ নারায়ণ মহারাজ, শ্রী শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীচক্রধর দাস, শ্রী দুঃখহরণ দাস, শ্রী সুন্দরানন্দ দাস প্রভৃতি মৃদংগ করতাল কাঁসরসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে এ শ্রীগুরুদেবকে স্থানীয় ভক্ত শ্রীমতী জানকী দাসীর গৃহে লইয়া আসেন। গৃহটির আশ্রমোচিত পরিবেশ দৃষ্ট হয় এবং আরতি পূজা ও ভোগরাগ যথাবিধি হইয়া থাকে।

উক্ত দিবস অপরাহ্ন সাড়ে ৪ ঘটিকায় সুসজ্জিত বিরাট প্যাণ্ডেলে সভার প্রারম্ভে স্থানীয় নামহট্ট সংঘ মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন শুরু করেন। বারাণসী মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিচারু গোবিন্দ মহারাজ প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করেন। তৎপরে বোম্বাই মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্য্যটক মহারাজ, পাটনা মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ এবং মিশনের সহ-সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত গুরুশিষ্য সংবাদ অবলম্বনে ভগবদ্ ভজনই জীবের একমাত্র নিত্য এবং আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের বিষয় তৎপ্রসঙ্গে হরিকথা পরিবেশন করেন অতঃপর গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ ভাগবদ্ধর্ম্মনুশীলনেই জীবের পরাশান্তি প্রাপ্তি সম্ভব এতদ্বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। তদনন্তর পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব সহস্রাধিক শ্রদ্ধালু সজ্জন সমক্ষে হরিভজন ব্যতীত জীবের আত্মার নিত্য কল্যাণ লাভের বিকল্প রাস্তা নাই এতৎপ্রসঙ্গে নাতিদীর্ঘ চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন।

পরদিবস ২২শে মার্চ, ২০১০ তারিখ রবিবার প্রাতঃকালে মঙ্গলারতি ও তুলসী পরিক্রমান্তে ত্রিদণ্ডীপাদগণ ও শ্রীপাদ বাসুদেব দাস, শ্রী নিতাই দাস, শ্রী ভক্তদাস প্রভৃতি ব্রহ্মচারী এবং শ্রীশচীসুনু দাসাধিকারী, রসিকানন্দ দাস শ্রী প্রফুল্ল নাইয়া প্রভৃতি গৃহস্থভক্তগণ এবং ভক্তমণ্ডলী যোগে শোভাযাত্রাসহ নগরকীর্ত্তন করা হয়।

উক্তদিবস অপরাহ্নকালের অধিবেশনে শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ প্রারম্ভিক ভাষণ দেন তৎপরে শ্রীপাদ সজ্জন মহারাজ, শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজ ও শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজ হরিকথা পরিবেশন করেন অতঃপর মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ গৌড়ীয় দর্শন প্রসঙ্গে হরিকথা পরিবেশন করেন। সান্ধ্য অধিবেশনে গুরুদেবের তথায় শুভবিজয়োপলক্ষে ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে আয়োজিত গুরুপূজা বাসরে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব গুরুপূজার তাৎপর্য্য বিষয়ে হৃদয়াকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন। মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্য পরিসমাপ্তি ঘটে।

তদনন্তর রাত্রি ৯ ঘটিকায় নামহট্ট সংঘের পরিচালনায় ''করুণাময় গৌর হরি''—নামক নাটক অভিনীত হয়।

—০—

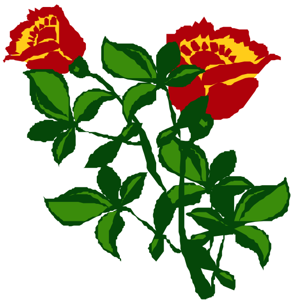

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি

শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত

যুগধর্ম্ম কি সনাতন, না আধুনিক কোন ব্যাপার?

চরম, পরম, নিত্য, সনাতন প্রয়োজন অধুনাতন কালে আমাদের দ্বারে দয়া করিয়া অতিথি হইয়াছেন বলিয়া আমাদের তাঁহাকে 'সেকেলে' বলিবার ছলনায় তাঁহার প্রতি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবার একটা বহির্ম্মুখিনী নৈসর্গিকী প্রবৃত্তি আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সূর্য্য সনাতন বলিয়া, জাহ্নবী সনাতনী বলিয়া, বায়ু সনাতন বলিয়া 'সূর্য্যের কিরণ, জাহ্নবীর ধারা, বায়ুর প্রবাহ আর বর্ত্তমান কালোপযোগী নহে, ইহা সেকালের প্রয়োজনানুরূপই ছিল' বলিলে জীবনধারণের মৌলিক উপাদান তেজঃ, জল, বায়ু প্রভৃতিকে অস্বীকার করার দরুণ আত্মহত্যাই ফল-লাভ হইবে। আমরা আত্মহত্যাকে 'প্রয়োজন' বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া জীবনের জীবনস্বরূপ ভগবদ্ভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম্মকে 'তাৎকালিক' বলিবার চেষ্টা করিতেছি!

যুগোপযোগী কি?

সুতরাং ''যুগোপযোগী'' বলিতে যে তাহা সনাতনকে বাতিল করিয়া মনগড়া শাস্ত্র, মনগড়া মত, যুগের বহির্ম্মুখ লোকের রুচির সঙ্গে যাহা খাপ খায়, সেইরূপ একটা মত হইবে, তাহা নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাই 'যুগমত' হইয়াছে! এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—অমুক ঠাকুরের দোহাই, অমুক কর্ত্তার দোহাই, অমুক প্রভুর দোহাই, অমুক বাবুর দোহাই-ই শাস্ত্র হইয়াছে! অমুক বলিয়াছেন,—সুতরাং ভাগবতের কথা নাকচ! অমুকের প্রামাণিকতা কতটুকু, অমুক 'ঠাকুর'-নামধারী, 'কর্ত্তা', 'প্রভু', 'বাবু' কতটা শাস্ত্রের অনুমোদিত, লোকের সেদিকে দৃষ্টি নাই। যেহেতু কোন ব্যক্তি, তাহার কোন না কোন যাদুবিদ্যার প্রভাবে বা গ্রহের গুণে জগতের সংখ্যাধিক্য বা দলবিশেষের সাহায্যে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হইয়াছে, সেই সংখ্যাধিক্যের মোহ অপরকেও মুগ্ধ করুক, লোকের উপর এইরূপ একটা অন্যায় ও অবৈধ পীড়াপীড়ি হইতেছে। বহির্ম্মুখ লোকেরও তাহাতে এইরূপ একটা মোহ ও স্বাভাবিকী রুচি উৎপন্ন হইয়াছে যে, সেই মোহ ও উত্তেজনায় পড়িয়া তাহারা যে-ঠাকুরের দোহাই দেয়, তিনি কতটা সনাতন শাস্ত্রের অনুগামী, তাহা দেখিবার মত অনাবৃত বৃত্তিটা তাহাদের স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে এবং তৎস্থানে ঐ সকল ঠাকুর প্রভৃতি নামধারীর নানাপ্রকার বুজরুকীই অলৌকিকতার নামে লোকের বিচারবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া তাহাদিগকে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হইতে দূরে পাতিত করিতেছে। ঐরূপ মনোধর্ম্মই 'যুগধর্ম্ম' বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ও হইতেছে! সরস্বতী ঐ সকল ব্যক্তির মুখে একদিকে ঠিক কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, কলিধর্ম্মই যুগোচিত ধর্ম্ম হইয়াছে!!

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বা প্রাকৃত শ্রীচৈতন্যদাসগণ কিম্বা তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণকারী শ্রীগৌড়ীয়মঠ এইরূপ বিচারকে যুগোপযোগী বলেন না, কিংবা সনাতনের একটা মৌখিক দোহাই দিয়া, সনাতনকে জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাগানের মালী বা রাইয়ত করিয়া সনাতনের নামে যথেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতার মনোধর্ম্মকে গণবাদের ভোটের দ্বারা সমর্থন করাইয়া যুগোপযোগী বলিতে চাহেন না। সূর্য্যের কিরণ, বায়ুপ্রবাহ, জলধারা—প্রাচীন বস্তু; কিন্তু বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতিতে কেহ যদি সূর্য্যকিরণকে, বায়ুপ্রবাহকে, জলধারাকে সম্পূর্ণ অবিকৃত রাখিয়া মানুষের নিকট অধিক সুলভ করিয়া দিতে পারে, তাহাতে সনাতনের প্রতি বিদ্রোহ হয় না। ভাগীরথীর জল সকলের দ্বারে দ্বারে বিতরণের জন্য যদি জলের কলের ব্যবস্থা হয়, তাহার দ্বারা গঙ্গার কিছু বিকৃতি হয় না—পতিতপাবনী গঙ্গা, যিনি সকল বস্তুকে শুদ্ধ করেন, তিনি অশুদ্ধা হইয়া পড়েন না—গঙ্গার তাহাতে পাবনত্ব হ্রাস হয় না; সূর্য্য ও বায়ুকে সর্ব্বত্র সুলভ করিবার জন্য যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ সকল প্রবাহের প্রতিবন্ধকগুলিকে সরাইয়া দেওয়া হয়, তাহার দ্বারা সনাতনের সনাতনত্ব

বিস্তারের আনুকূল্যই করা হয়, সনাতনকে বিকৃত, সনাতনকে বিপর্য্যস্ত বা সনাতনের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করা হয় না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্য সনাতন নহে, উহা অভিনব

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্য যেটুকু আপাত-দৃষ্টিতে ‘অভিনব’ মনে হয়, সেইটুকু ঐরূপ ভাবে সনাতনের সনাতনত্ব সম্পূর্ণভাবে অটুটু রাখিয়া সনাতনকে সর্ব্বত্র সুলভ করিয়া দিবার চেষ্টা—ইহাই অপর ভাষার সনাতনকে যুগের যোগ্যতানুযায়িরূপে প্রকট করা। এই বিষয়টি অনেকে ধরিতে না পারিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার-প্রচার-দর্শনে আর একটি ভুল করিয়া বলেন—

আর একটি ভুল—শ্রীগৌড়ীয় মঠ বিষয়-বাহনগুলি ব্যবহার করেন কেন?

“শ্রীচৈতন্যদেব ত’ মোটর যান ব্যবহার করেন নাই, রেলগাড়ী ব্যবহার করেন নাই, মুদ্রাযন্ত্র ব্যবহার করেন নাই, সাময়িক পত্র প্রচার করেন নাই, মঠ করেন নাই, রাজা-মহারাজার দ্বারে যান নাই, জনসঙ্গ করেন নাই; কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠ ঐ সকল করেন কেন?”

সমাধান ঃ— পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, ‘সনাতনে’র সনাতনত্ব অটুট রাখিয়া সনাতনকে ‘সুলভ’ করিয়া দেওয়াই শ্রীগৌড়ীয়মঠের যুগোপযোগী দান। লোকের যুগোপযোগী ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন-সরবরাহকে শ্রীগৌড়ীয় মঠ যুগোপযোগী দান মনে করেন না। ❑

শ্রীশ্রীনৃসিংহাবির্ভাব

শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত

জয় নৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মমুখ পদ্মভৃঙ্গ ॥

শ্রীনৃসিংহদেবের কথা বলিতে প্রহ্লাদের কথাই আগে মনে পড়ে, তাহার কারণ ভক্তই ভগবানকে প্রকাশ করেন। আবার ভক্ত যেমন ভগবানকে অন্বয়ভাবে প্রকাশ করেন, ব্যতিরেকভাবে অভক্ত সম্প্রদায়ও সেইরূপ ভক্ত ও ভগবানের লীলার পুষ্টি সাধন করে; তাই আমরা ভক্ত ভগবানের লীলার মধ্যে উদ্ধব নন্দ যশোদা বসুদেব দেবকী হনুমান বিভীষণ সুগ্রীব প্রভৃতির নাম যেমন শুনিতে পাই, কংস জরাসন্ধ শিশুপাল রাবণ প্রভৃতির নামও তদ্রূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

সমুদ্র মন্থনের ঠিক পূর্ব্বে দৈবতাধিকারে দেবাসুরের প্রথম দ্বন্দ্ব হয়। তৎকালে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ অসুরকুলচূড়ামণি হিরণ্যকশিপুর গৃহে আবির্ভূত হন। কথিত আছে, প্রহ্লাদ যখন গর্ভে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মাতা কয়াধূ দেবর্ষি নারদের আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক ভক্তমুখে স্বয়ং-উচ্চারিত শ্রীশ্রীহরিনাম নিরন্তর কর্ণপুটে পান করিতে করিতে পরমানন্দে কাল যাপন করিতেন। সেই কথা গর্ভস্থ শিশু প্রহ্লাদের কর্ণপথ-গত হওয়ায় তিনি অসুরকুলে আবির্ভূত হইলেও জন্মাবধি হরিভক্ত ছিলেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুবিদ্বেষী প্রকৃত শাক্ত অথবা জৈনগন্ধি বেদান্তীর ন্যায় ‘হাম খোদা’ অভিমানী ছিলেন বলিয়া পুত্রের হরিভক্তি তাঁহার বক্ষে শেল বিদ্ধ করিত। তথাপি হিরণ্যকশিপু পুত্রস্নেহে আসক্ত হইয়া প্রথমে প্রহ্লাদের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করেন নাই, কিন্তু যখন দেখিলেন, প্রহ্লাদের প্রতিজ্ঞা পাষাণের রেখার ন্যায় অচল ও অটল, তখন তিনি তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা ভগবান্ অবস্থান করিতেন বলিয়া তাঁহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ জন্য ভয় ছিল না। তিনি নির্ভীক চিত্তে সর্ব্বত্র নারদোপদিষ্ট হরিকথা

শ্রীঃ ভঃ পঃ/৪৭বর্ষ/মে/১০ম/২০১০

প্রচার করিতেন। পাঠদ্দশায় সহাধ্যায়ীদিগকে বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ অর্চ্চন, বন্দন, পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানই যে সর্ব্ব বিদ্যাচরম, তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু ও তদনুগত অসুরবৃন্দ মিষ্টবাক্যের পরে নানাবিধ ভয় প্রদর্শন করিয়াও যখন তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা প্রহ্লাদের প্রাণ সংহারে কৃতসংকল্প হইলেন।

কিন্তু ভগবান্ যাঁহার সহায়, তাঁহাকে কে বধ করিতে পারে; তাহারা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া ভক্তের প্রতি যে অত্যাচার করে, তাহই তাহাদের আত্মবিনাশের হেতু হয়। ভক্তরক্ষক ভগবান্ তাঁহার নিত্য নৃসিংহ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া ভক্তিপ্রচারক পরমভাগবতগণের যাবতীয় বিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক অসুরকুলের ধ্বংস সাধন করেন। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল, ভক্তৈকসংরক্ষক নৃসিংহদেব স্বীয় মূর্ত্তি প্রকট করিয়া কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাসক্ত জনগণের নেতা হিরণ্যকশিপুর বিনাশ সাধন পূর্ব্বক ভক্তিমার্গের কণ্টক দূর করিয়া ভগবৎ সেবানন্দ-মূর্ত্তি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিলেন। সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্যবর্গ সকলেই শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আশ্রয়েই পাষণ্ড দলন করিয়া থাকেন। তৎকালে হিরণ্যকশিপুর আনুগত্যে যে সকল লোক প্রহ্লাদাভিন্ন ভক্তদিগের প্রতি অত্যাচার করেন, অথবা কামক্রোধাদিরূপ নক্র মকরাদি যে অনেক সময় ভক্তের ভজনে বাধা প্রদান করে ভগবান্ নৃসিংহদেব ভক্তের হৃদয়ে থাকিয়া হুঙ্কারদ্বারা সর্ব্ব অসুরকুলের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেন। সিংহরবে করিগণ যেমন দূরে পলায়ন করে ঐকান্তিক ভক্তের নিকট হইতে অসুরবৃন্দ তথা কামক্রোধাদি লক্ষ যোজন দূরে অবস্থান করে। অতএব আচার্য্য ও তদনুগত শিষ্যবর্গ সকলেই শ্রীশ্রীনৃসিংহ-উপাসক। শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা ব্যতীত জাগতিক বিঘ্নসমূহ অতিক্রম করিয়া উন্নত রসাবিকার লাভ করা যায় না।

নৃসিংহ-তত্ত্ব

তত্ত্ববিচারে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দশবিধ স্বাংশ অবতারের অন্যতম। স্বয়ংভগবান্ সর্ব্ব কারণ-কারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম হইতে বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বূহ লীলা প্রকটিত হয়। বাসুদেবের বৈভব প্রকাশ সংকর্ষণ হইতে কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতারলীলা প্রকট হয়। আবার গর্ভোদশায়ী পুরুষই যাবতীয় অংশাবতার যুগাবতার মন্বন্তরাবতার প্রভৃতি অবতার বর্গ প্রাকট্যের কারণ, শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব গর্ভোদশায়ী-প্রকটিত দশবিধ স্বাংশ অবতারগণের মধ্যে রাম নৃসিংহ বামন এই তিন পরাবস্থ অবতারের অন্যতম।

শাস্ত্রে চতুর্ব্বূহ যেরূপ প্রসিদ্ধ, নবব্যূহও তদ্রূপ প্রসিদ্ধ। ''পুরীর আবরণরূপে পুরীর নবদিশে। নবব্যূহরূপে নবমূর্ত্তি প্রকাশে॥'' এই নবব্যূহ মধ্যে নৃসিংহদেবের নাম দেখা যায়। আবার বাসুদেব সংকর্ষণে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্ব্যূহ মূর্ত্তির আট জন বিলাসমূর্ত্তির অন্যতমরূপে শ্রীনৃসিংহদেবকে দেখিতে পাই। এই নৃসিংহদেব বা নবব্যূহান্তর্গত শ্রীনৃসিংহদেবের সহিত ভক্তৈকসংরক্ষক হিরণ্যকশিপু-বিদারক শ্রীনৃসিংহদেবের লীলাগত পার্থক্য আছে।

বাগীশা যস্যবদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ রক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তংনৃসিংহমহং ভজে॥

"জয় নৃসিংহ শ্রীনৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মমুখপদ্ম ভৃঙ্গ।
বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥

ইতো নৃসিংহো পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥"

শ্রীচন্দনযাত্রা

(শ্রীক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত)

শ্রীজগন্নাথ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নকে (উৎকলখণ্ড, ২৯শ অ) বলিয়াছিলেন,-

"বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিকা।
তত্র মাং লেপয়েদ্‌গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্।।

অর্থাৎ বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়া-নাম্নী তিথিতে সুগন্ধি চন্দনদ্বারা আমার অঙ্গ লেপন করিবে।

শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে লিখিত আছে,---

অনুলেপনমুখ্যস্তু চন্দনং পরিকীর্তিতম্।

অর্থাৎ অনুলেপন-দ্রব্যসমূহের মধ্যে চন্দনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্তিত।

শ্রীনারদপুরাণে লিখিত আছে,--

যথা বিষ্ণোঃ সদাভিষ্টং নৈবেদ্যং শালিসম্ভবম্।
শুকেনোক্তং পুরাণে চ তথা তুলসীচন্দনম্।।

পুরাণসমূহে ও শ্রীশুকদেব-কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, যেরূপ শালিধান্যোৎপন্ন অন্ন শ্রীহরির প্রীতিকর, তুলসী-চন্দনও সেইরূপ প্রীতিকর।

শ্রীপুরুষোত্তমদেব তৎসেবক বৈষ্ণবরাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নদেবকে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের অক্ষয়-তৃতীয়া-নাম্নী তিথিতে নিজ শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দনলেপনের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন; আজও তদনুসারে অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি পর্যন্ত প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীমদনমোহনদেবকে শ্রীমন্দির হইতে বিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীনরেন্দ্রসরোবরকূলে আনয়ন করা হয়। শ্রীমদনমোহনদেব স্বীয় মন্ত্রী শ্রীলোকনাথ-মহাদেবাদির সহিত সরোবরে নৌকাবিলাস করেন। শ্রীমদনমোহনের শ্রীচন্দনযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া শ্রীনরেন্দ্রসরোবরকে 'চন্দন-পুকুর' ও বলা হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,--

এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা।
দৈবে জগন্নাথের সেদিন জল-লীলা।।
নরেন্দ্রের জলে 'গোবিন্দ' নৌকাতে চড়িয়া।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ-লঞা।।
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি রঙ্গে।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ১০।৪১-৪৭)

* * *

গৌড়ীয়া-সম্প্রদায় সব করেন কীর্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন।।
জলক্রীড়া, বাদ্য, গীত, নর্তন, কীর্তন।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন।।
গৌড়ীয়া-সংকীর্তনে আর রোদন মিলিয়া।
মহাকোলাহল শব্দ হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া।
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে।
সবা লঞা জলক্রীড়া করেন কুতূহলে।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ১০।৪৬-৪৯)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রালীলা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,-

* * *

আঠারনালা হইতে দশদন্ড হইলে।
মহাপ্রভু আইলেন নরেন্দ্রের কূলে।।
হেনকালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ।
জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র।।
হরিধ্বনি-কোলাহল, মৃদঙ্গ, কাহাল।
শঙ্খ, ভেরী, জয়ঢাক বাজয়ে বিশাল।।
সহস্র সহস্র ছত্র, পতাকা, চামর।
চতুর্দিকে শোভা করে পরম সুন্দর।।
মহা-জয়জয়-শব্দ, মহা-হরিধ্বনি।
ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি।।
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা-কুতূহলে।
উত্তরিলা আসি' সবে নরেন্দ্রের কূলে।।
জগন্নাথ-গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী সনে।
মিশাইলা তানাও ভুলিলা-সঙ্কীর্তনে।।

দুই গোষ্ঠী এক হই' কি হৈল আনন্দ।
কি বৈকুণ্ঠ-সুখ আসি' হৈল মূর্তিমন্ত।।
চতুর্দিকে লোকের আনন্দ-অন্ত নাই।
সব করেন, করায়েন চৈতন্যগোসাঞী।।
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
চতুর্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায়।।
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়।
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।।
প্রভুও সকল ভক্ত লই' কুতূহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১০১-১১২)

ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন শ্রীচন্দনযাত্রার দিনে মহাপ্রভু ও ভক্তগণের নরেন্দ্রজল-বিহার-লীলা এইভাবে কীর্তন করিয়াছেন,--

শুন, ভাই ! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতার।
যেরূপে নরেন্দ্রজলে করিলা বিহার।।
পূর্বে যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি'।
মণ্ডলী হইয়া করিলেন জলকেলি।।
সেইরূপে সকল বৈষ্ণবগণ মেলি'।
পরস্পর করে ধরি' হইলা মণ্ডলী।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১১৩-১১৫)

* * *

শ্রীগোবিন্দ রামকৃষ্ণ-বিজয় নৌকায়।
লক্ষ-লক্ষ লোক জলে হরিষে বেড়ায়।।
সেই জলে বিষয়ী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী।
সবেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি'।।
হেন সে চৈতন্যমায়া সে-স্থানে আসিতে।
কা'রো শক্তি নাহি, কেহ না পায় দেখিতে।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১২৭-১২৯)

* * *

যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী-যমুনা।
নরেন্দ্রজলের হইল সেই ভাগ্য-সীমা।।
এ-সকল লীলা, জীব-উদ্ধার কারণে।
কর্মবন্ধ ছিণ্ডে ইহা শ্রবণে পঠনে।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৪০-১৪১)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচন্দনযাত্রা-দিবসে শ্রীচন্দন-পুষ্করিণীতে জলকেলি করিয়া শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিবার জন্য সকল ভক্তের সহিত উপস্থিত হইলেন,-

তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া।
জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সবা' লঞা।।
জগন্নাথ দেখি' প্রভু সর্বভক্তগণ।
লাগিলা করিতে সবে আনন্দে রোদন।।

(চৈঃ চঃ অ।১৪২-১৪৩)

* * *

জগন্নাথ দেখি', জগন্নাথ নমস্করি'।
বাসায় চলিলা গোষ্ঠী-সঙ্গে গৌরহরি।।
যে ভক্তের যেন রূপ চিত্তের বাসনা।
সেইরূপ সিদ্ধ করে' সবার কামনা।।
পুত্রপ্রায় করি' সবে রাখিলেন কাছে।
নিরবধি ভক্ত সব থাকে প্রভু-পাছে।।
যতেক বৈষ্ণব--গৌড়দেশে, নীলাচলে।
একত্রে থাকেন সবে কৃষ্ণ-কুতূহলে।।

(চৈঃ চঃ অ।৮।১৬৩-১৬৬)

অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে প্রত্যহ অপরাহ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধি শ্রীমদনমোহন, শ্রীলক্ষ্মী ও সরস্বতীদেবীর সহিত বিমানারোহণে শ্রীনরেন্দ্রসরোবর-তীরে গমন করেন। কিংবদন্তী এই যে, তিনশত বৎসর পূর্বে বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্য উৎকল-জয়ার্থ যাত্রা করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধি শ্রীগোবিন্দ-দেবকে শ্রীপুরুষোত্তম হইতে টাকীর সন্নিকটে রায়পুরে স্থাপন করেন। তদবধি শ্রীচন্দনযাত্রায় শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে শ্রীগোবিন্দ-দেবের পরিবর্তে শ্রীমদনমোহনের বিজয় হইয়া থাকে; আর একটি বিমানে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ, এবং পাঁচটি পৃথক্ বিমানে শ্রীলোকনাথ, শ্রীযমেশ্বর, শ্রীকপালমোচন, শ্রীমার্কণ্ডেয়েশ্বর ও শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর-এই পঞ্চ মহাদেবের বিজয়মূর্তি বিজয় করেন। একবিংশ-দিবসব্যাপী এই যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির হইতে শ্রীনরেন্দ্রসরোবর পর্যন্ত রাজপথের স্থানে স্থানে পত্রপুষ্পফলাদি-শোভিত ছায়ামণ্ডপ নির্মিত হয়। শ্রীমদনমোহন বিমানারোহণে শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে গমনকালে সেই সকল ছায়ামণ্ডপে উপনীত হইয়া বিশ্রাম, পঙ্ক্তি ভোগগ্রহ, নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করেন। এইরূপে ভোগগ্রহণ করিতে করিতে শ্রীনরেন্দ্রসরোবর-সমীপে উপনীত

হন। শ্রীনরেন্দ্রের বক্ষে একটি সুসজ্জিত নৌকায় শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-সরস্বতীর সহিত শ্রীমদনমোহন এবং আর একটি পৃথক্ নৌকায় মন্ত্রী পঞ্চমহাদেবের সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আরোহণ করেন। প্রথমটিতে দেবদাসীগণের নৃত্য ও দ্বিতীয়টীতে 'নাটুয়া পিলা'র (নৃত্যকারী বালকের) নৃত্য হয়।

সরোবরের মধ্যবর্তী স্থানে যে তিনটি মন্দির আছে, তাহার মধ্যে বৃহত্তমটির মধ্যভাগে একটি কূপ আছে। সেই কূপোদকে শ্রীমদনমোহন, শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীসরস্বতীকে স্নান করান হয়। দ্বিতীয় মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তৃতীয়টিতে পঞ্চ মহাদেব বিরাজ করেন। এখানে তাঁহাদের পূজা ও ভোগ হয়। সরোবরে উভয়-তট ও উক্ত মন্দিরসমূহ দীপ-মালায় বিভুষিত করা হয়। উৎসব সম্পন্ন হইলে পূর্ববৎ সাতটি বিমানে অরোহণ করিয়া শ্রীমূর্তিগণ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। গন্তব্যস্থানে উপনীত হইতে প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হয়। একবিংশ দিবসই এক প্রকার গমনাগমন হইয়া থাকে এবং প্রত্যহ শ্রীশ্রীমদনমোহনকে পৃথক্ পৃথক্ বেশে ভূষিত করা হয়। অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে 'নটবর'-বেশ, চতুর্থীতে 'শ্রীকৃষ্ণজন্ম'-বেশ, পঞ্চমীতে 'রাজাধিরাজ'-বেশ, ষষ্ঠীতে 'শ্রীবনবিহারী'-বেশ, সপ্তমীতে 'বৎসহরণ'-বেশ, অষ্টমীতে 'গোমতীকৃষ্ণ'-বেশ, নবমীতে 'খট-দোলি'-বেশ, দশমীতে 'চক্রনারায়ণ'-বেশ, একাদশীতে 'নৌ-কেলি'-বেশ, দ্বাদশীতে 'নটবর'-বেশ, ত্রয়োদশীতে 'শ্রীরাসমণ্ডল'-বেশ, চতুর্দশীতে 'কন্দর্পরথ'-বেশ, পূর্ণিমাতে 'অঘাসুরবধ'-বেশ, কৃষ্ণপ্রতিপদে 'রঘুনাথ'-বেশ, দ্বিতীয়াতে 'শ্রীচৈতন্য'-বেশ, তৃতীয়াতে 'গিরিগোবর্ধন'-বেশ, চতুর্থীতে 'গিরিধারী'-বেশ, পঞ্চমীতে 'বস্ত্রহরণ'-বেশ, ষষ্ঠীতে 'চিন্তামণিকৃষ্ণ'-বেশ, সপ্তমীতে 'গজ উদ্ধারণ'-বেশ হয়;অষ্টমীতে কোন স্বতন্ত্র বেশ হয় না। চন্দন যাত্রার বিংশতিতম দিবসে 'ভাউরি' অর্থাৎ নৌকাকে শ্রীবিজয়বিগ্রহগণসহ শ্রীনরেন্দ্রসরোবরের জলে ঘুরানো হয়। একবিংশতিতম দিবসে অর্থাৎ যাত্রার শেষ দিনে নৌকা দুইটিতে হলুদজল ছিটান হইয়া থাকে। চন্দনযাত্রার নামান্তর **'গন্ধলেপন-যাত্রা'**।

ব্রতোৎসব তালিকা

২৬ পুরুষোত্তম, ২৬শে বৈশাখ ১০ই মে সোমবার কৃষ্ণ-একাদশী কামদা (পুরুষোত্তমী) একাদশীর ব্রতোপবাস (পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, মোঘলসরাই, কাশী প্রভৃতি স্থানে)। দিল্লী, মুম্বাই, মথুরা, বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, কুরুক্ষেত্র, চেন্নাই ইত্যাদি স্থানে ব্যঞ্জলি মহাদ্বাদশীর ব্রতোপবাস।

২৭ পুরুষোত্তম, ২৭শে বৈশাখ ১১ই মে, ২০১০ মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ন ৬।৩৬ মধ্যে একাদশী ও মহাদ্বাদশী ব্রতের পারণ।

৩০ পুরুষোত্তম, ৩০শে বৈশাখ ১৪ই মে, ২০১০ শুক্রবার অমাবস্যা প্রাতঃ ৬।৩৪ গতে মলমাস বা অধিবাস নামান্তর পুরুষোত্তম মাস নিবৃত্তি। শ্রীপুরুষোত্তম ব্রত সমাপন।

১৭ মধুসূদন ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৬ই মে রবিবার অক্ষয়তৃতীয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রারম্ভ। অদ্য নটবর বেশ। গৌড়ীয় মিশন ও তাঁর সমস্ত শাখামঠ সমূহে ২১ দিন ব্যাপী চন্দনযাত্রা উৎসব আরম্ভ।

২১ মধুসূদন ৫ জ্যৈষ্ঠ ২০শে মে বৃহস্পতিবার গৌরসপ্তমী জহ্নুসপ্তমী, জাহ্নবীপূজা, গঙ্গোৎপত্তি। চন্দনযাত্রার পঞ্চম দিবস। অদ্য বৎসহরণ বেশ।

২৫ মধুসূদন ৯ জ্যৈষ্ঠ ২৪শে মে সোমবার গৌরএকাদশী মোহিনী একাদশীর ব্রতোপবাস। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থরাজে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত অমৃত প্রবাহ ভাষ্য জয়ন্তী। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধীর তিরোভাব শ্রীশ্রীচন্দনযাত্রার নবম দিবস। অদ্য নৌকেলী বেশ। পরদিন ৭।৫৮ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ।

২৮ মধুসূদন ১২ জ্যৈষ্ঠ ২৭মে বৃহস্পতিবার গৌরচতুর্দ্দশী। শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের শুভাবির্ভাব। প্রদোষে সন্ধ্যাকালে শ্রীনৃসিংহদেবের শুভ আবির্ভাব অভিষেক। মাধবী পূর্ণিমা। অদ্য চন্দনযাত্রার দ্বাদশ দিবস। অদ্য কন্দর্পরথ বেশ। পরদিন পূর্বাহ্ন ৯।২০ মধ্যে শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রতের পারণ।

৮ ত্রিবিক্রম ২০ জ্যৈষ্ঠ ৪জুন শুক্রবার কৃষ্ণসপ্তমী। শ্রীশ্রীচন্দনযাত্রার বিংশতি দিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভাউরী বা ভৌরী উৎসব অদ্য গজউদ্ধারণ বেশ।

৯ ত্রিবিক্রম ২১ জ্যৈষ্ঠ ৫ জুন শনিবার কৃষ্ণ অষ্টমী। শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় হৃষীকেশ মহারাজের ২২তম বার্ষিক তিরোভাব উৎসব শ্রীচন্দনযাত্রার একোবিংশতি দিবস বা সমাপ্তি দিবস।